রংদার রোববার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ অক্টোবর ২০২০ নয়

অন্ধকার যতই হোক, ধারালো রাংতামোড়া শৈশব ফিরে এল

একটা ভাইরাস, সাধারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তি আমাদের সমস্ত পারমাণবিক ঔদ্ধত্যকে ধুলোর মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। তারই মাঝে স্মৃতির পুজোয় দেবজ্যোতি মিশ্র

বলতে দ্বিধা নেই, এ পৃথিবীর সঙ্গে আমরা যে নির্মম খেলায় মেতে উঠেছিলাম, আমাদের মস্তিষ্কে অহরহ যে মৃত্যুবিষ জন্ম নিয়েছে করোনা তার কাছে নিতান্তই শিশু। আমরা দেখেছি, পৃথিবী তাকিয়ে থাকে যে সব শহরের দিকে, বিস্মিত হয়, ঘর বাঁধার কিংবা চাকরি করবার স্বপ্ন দেখে, সেসব দেশে এই কদিন আগে দেখেছি মৃত্যুমিছিল। দেখেছি, গণকবরেও যেন শেষ হয় না মৃত্যুর চরাচর। সর্বস্বান্ত মানুষ দু-হাত পেতে দাঁড়িয়েছে নীরব মৃত্যুর মুখোমুখি। পৃথিবী তাকিয়ে থাকে, ফ্যালফ্যাল করে দেখে গণকবরে শোকটুকু জানানোর জন্য কোনও প্রাণ হাজির নেই আজ। একটা ভাইরাস, সাধারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তি আমাদের সমস্ত পারমাণবিক ঔদ্ধত্যকে ধুলোর মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে।

আমাদের বুকের গভীরে থাকা আশার আলোই এই অনিশ্চয়তার অন্ধকার ভেদ করবে। সেই আশাকেই উজ্জীবিত করতে যাদবপুরের শ্রমজীবী ক্যান্টিন একেবারে ফ্রন্টলাইনে। এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও কোথাও যেন হ্যামলিনের বাঁশির মতো আলো জেগে থাকে। নিরাময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দুঃখের পৃথিবীতে। এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যাদবপুরের ছাত্র-যুবসমাজ কি কঠিন লড়াই লড়ছে হাসিমুখে। খাবার পৌঁছে দিচ্ছে, পৌঁছে দিচ্ছে ওষুধ। নিরন্তর অসহায় মানুষগুলোর মুখে অন্ন দিয়ে চলেছে মাসের পর মাস। এরাই আমার আলো, এরাই আমার আলোকিত ভারতবর্ষ। তাই এই নিষ্করুণ করোনা দিনেও আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, কোথাও গিয়ে মানুষ জিতে যাবেই। এ সময় হাল ছাড়ার নয়, এ সময় দৃঢ় সংকল্পের।

এই দুঃসময়ের মাঝেও পুজো আসে। মনে পড়ে যায় সেই রাংতামোড়া ছেলেবেলার কথা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা টকটকে লাল রঙের ডাকবাক্স। সেখানে আজও চিঠি পাই, রঙিন খামের চিঠি, হরেক রকমের নকশার ডাকটিকিট লাগানো চিঠি। সেই সব ডাকটিকিটের জলছবিতে ফুটে ওঠে আবছা শহর, ধূসর মফস্‌সল, আধোচেনা গ্রাম, অনেক দূরে থাকা বড়মাসির চালধোয়া হাতের গন্ধ। মাকে লেখা বড়মাসির চিঠি 'সুন্দরদি, কেমন আছিস?...সুন্দরদি, আমার বিজয়ার প্রণাম নিস।' এই দুই বাক্যের মাঝখানে থেকে যাওয়া ডট চিহ্নগুলোর মধ্যে ডুবে রয়েছে বড়মেসোর কারখানা বন্ধ হওয়ার খবর, খুকুমণিদির সিঁদুরখেলা থেকে মুখ লুকিয়ে সরে থাকার খবর। খুকুমণিদির বর তখন কোথায়? এক ছাপোষা পুলিশ। সত্তরের দমকা হাওয়ায় কীভাবে যেন 'নেই' হয়ে গিয়েছেন। সিঁদুরখেলা আর সম্ভব নয়। সোদপুরের মফস্‌সলি আবহাওয়ায় কোনওমতে পুজোটাকে কাটিয়ে দেন, এই মাত্র। তবুও তো দুর্গাপুজো হত! টালিগঞ্জ চণ্ডীতলায় টেরিলিনের জামায় আমরা খুশি ছিলাম। মধু-বিধু দুই ভাই খুশি ছিলাম যা পাই তাতেই। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপে আমাদের বেহালা বাজানোর অনুষ্ঠান থাকত। দুটো জামা-প্যান্ট, কখনও বা একটা। বাবা অনেক সময়েই দিয়ে উঠতে পারতেন না। বাবুকাকার আদরের টেরিলিন একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠত যেন। আমাদের পারিবারিক দর্জি ছিলেন অমলকাকু। মা-ঠাকুমার ব্লাউজ-সেমিজ থেকে আমাদের দুই ভাইয়ের জামা-প্যান্টের মাপ-ঘের-ইঞ্চি ছিল তাঁর জানা। বাবা-কাকাদের ইনস্ট্রাকশনের বাইরে গিয়ে অমলকাকুর সঙ্গে অন্য আলাপ চলত আমাদের। একটু স্টাইল, এই পকেটটা একটু অন্য কায়দার, কলারে খানিকটা বিশেষত্ব— এই সব আর কী। কেন জানি না পুজো এলে এই মুখটাই মনে পড়ে।

মনে পড়ে, হাতে বিরাট ভারী পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করছেন শীর্ণ চেহারার এক পুরোহিত। শীর্ণ অথচ দিব্যকান্তি। সে কি হাতের জোর! দীর্ঘ সময় ধরে ঘুরে চলেছে পঞ্চপ্রদীপ। আর আলোগুলো 'ব্লার' হয়ে যাচ্ছে কখনও, কখনও আবার স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। মনে হত, এটা কি সত্যিই তাঁর নিজের হাতের জোরে সম্ভব হচ্ছে, না কি দেবীর মহিমা! 'প্যান্ডেল হপিং' শব্দটা চালু ছিল না সেই সময়ে। তবু চড়াও হয়েছি সমস্ত প্যান্ডেলে। অনেক রঙের শাড়ি, বন্ধুবান্ধব, ক্যাপ ফাটানো, নাটবল্টু, বেলুনওয়ালা— তোমরা কোথায় এখন? নারায়ণদা, রিলক্যাপের বন্দুকওয়ালা, তুমিই বা কোথায়? টিনের বন্দুকে লাল রিলক্যাপ ফটফট ফেটেই কি জানান দিত, পুজো এসেছে?

পুজোর নতুন জুতো— পুজোর ফোস্কা। জুড়োতে জুড়োতে সেই কালীপুজো। তাই ষষ্ঠী-সপ্তমী খুঁড়িয়ে অষ্টমী থেকে আবার পুরনো জুতো সম্বল করেই মাইল মাইল হেঁটে ঠাকুর দেখা। মহালয়ার গানের সঙ্গে মিশে যেত লতা-সলিল, মিশে যেত আশা-পঞ্চমের গান। স্তোত্রে জেগে ওঠা ভোর কেমন করে 'আধুনিক' হয়ে যেত বেলা বাড়লেই। সারা পৃথিবীর কোথাও কি এমন প্রত্যূষ আছে? এমন প্রত্যূষ বাংলা পেরিয়ে কে শুনেছে কোথায়? মহালয়ার ভোরে অনেক অনেক বাড়ির রেডিও একসঙ্গে বেজে উঠলে মনে হত কাছের রেডিওটা যেন দূরের রেডিওর প্রতিধ্বনি। তার পর এক সময়ে সবটা মিলেমিশে যেত।

> স্মৃতির পেটিকায় টকটকে সেই লাল রঙের ডাকবাক্স। পুজো এলে সেখানে আজও চিঠি পাই, রঙিন খামের চিঠি। সেইসব ডাকটিকিটের জলছবিতে ফুটে ওঠে বড়মাসির চালধোয়া হাতের গন্ধ।

পুজোর ভাসানে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। নদীর পাড়ে সে যে কীসের প্রতীক্ষা, কে জানে! লালচে আখের স্বাদ, মানুষের জমায়েত, প্রতিমা, ঢাকের আওয়াজ, প্রশেসনে ছেলেদের উদ্দাম নাচ সব কিছুর জন্যই কি সেই প্রতীক্ষা? না কি সেই প্রতীক্ষা আবহমানের বিদায় জানানোর প্রতীক্ষা?

জলে প্রতিমা পড়লে সাহসী সাঁতারু বন্ধুরা ঝাঁপ দিত। ডুব দিয়ে তুলে আনত ঠাকুরের অস্ত্রশস্ত্র। আমাদের যে সাহস হয়নি কখনও। তাই বিসর্জন থেকে ফেরার পথটা ছিল অস্ত্রের গৌরবহীন, একা। সেই নিরস্ত্র, টিমটিমে প্রদীপ জ্বলা সন্ধ্যায় বিজয়ার বিষণ্ণতা দীর্ঘ আকার পেত বাড়িতে ঢোকার পর।

পৃথিবী আজ বড় অসুস্থ। ধরিত্রীর সন্তানেরা আজ মারণ রোগে আক্রান্ত। জীবন দেবতার কাছে তাই আমাদের প্রার্থনা সবার, এই রোগ-তাপ ও দুঃসময় মুছে, আমাদের জীবনে শান্তি ফিরে আসুক।

স্মৃতি সংকলনে তিয়াস চট্টোপাধ্যায়

বড়চর্চা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার শব্দ বদলে দিয়েছিলেন সদ্য প্রয়াত প্রণম্য শিল্পী প্রদীপ ঘোষ!

রমাপদ পাহাড়ি

প্রদীপ ঘোষ তখনও সেই অর্থে 'আবৃত্তিকার'-এর তকমা পাননি। তবে আবৃত্তি করেন পরম আনন্দে যত্রতত্র। জীবনে প্রথম একটা বড় জায়গায় সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। সে ব্যাপারে তরুণ তুর্কী প্রদীপকে সুপারিশ করেছিলেন হিন্দু হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কবি ড. হরপ্রসাদ মিত্র। পাঠিয়েছিলেন সুপারিশপত্রও। প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন আকাশবাণীর পরামর্শদাতা। প্রদীপের আগমনে প্রেমেন মিত্র নিজেই দরজা খুললেন। কিন্তু অর্ধেক দরজা খুলে প্রদীপকে বললেন, বাবা তোমার মতো একজন কলেজের ছেলেকে তো আকাশবাণীতে সুযোগ দেবার কোনও উপায় আমার নেই। সেখানে কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে থেকে আমাকে ডাকবে, প্রবোধকে ডাকবে। আর অভিনেতাদের মধ্যে থেকে শম্ভুকে ডাকবে। কাজীর ছেলে সব্যসাচীকে ডাকবে। এইসব নামিদামিদের প্রধানত ব্যবহার করা হত সাহিত্যবাসর, গীতিআলেখ্য প্রভৃতিতে গ্রন্থনা বা ভাষ্য বা কোনও কবিতা পাঠে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সেদিন কিছুটা কুণ্ঠিত স্বরে বলেছিলেন, তোমাকে কোথা থেকে সুযোগ দেব? কিছু মনে করো না। ফিরে এসেছিলেন প্রদীপ ঘোষ। সেই কলেজে পড়ার সময় থেকেই প্রদীপের সঙ্গে সে সময়ের প্রধান কবি-সাহিত্যিকদের পরিচয় ক্রমশ ঘন হচ্ছে। বিষ্ণু দে ছিলেন মৌলানা আজাদ কলেজে প্রদীপের অধ্যাপক। 'আবৃত্তি' শিল্পকে চর্চা করে উপস্থাপিত করা বা অনুষ্ঠান করার বিষয়ে সেই তরুণ বয়স থেকেই স্বপ্ন দেখতেন প্রদীপ। শৈশবকাল থেকে বহু অনুষ্ঠানে অভ্যস্তও বটে। এমনকি দর্শনীর বিনিময়ে যেসব অনুষ্ঠান হয়, সেখানেও বিস্তর নাম কুড়িয়েছেন। যাইহোক, এরপর প্রেমেনবাবুর সঙ্গে প্রদীপের এমন একটা অনিবার্য স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হল যে, তিনি কবিতা লিখে খবর পাঠাতেন। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে যে ঘরে উনি থাকতেন, সেখানে প্রদীপ হাজির হলেই খুশি হয়ে বলতেন, যাও ওই ঘরের মধ্যে নতুন দু-তিনটে কবিতা রেখেছি তোমার জন্যে, তুমি পড়ো জোরে জোরে। কবিতার উচ্চারিত পাঠ নিয়ে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। নিজেও ভালো আবৃত্তি করতেন। ওঁর একটা নিজস্ব ঢঙ ছিল। তিনি বলতেন, তুমি উচ্চারণ করে দেখো, এই শব্দগুলো তোমার ঠিকঠাক লাগছে কিনা বা কোনও অসুবিধা মনে হচ্ছে কিনা! যদি কোথাও মনে করো যে, শব্দ বদলাবার দরকার তাহলে বলো। এতটাই প্রদীপকে গুরুত্ব দিতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বলতেন, তুমি পেন্সিল দিয়ে পাশে লিখে দাও। যেমন 'নদীর নিকটে' নামে প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে কাব্যগ্রন্থ আছে, সেখানে দু-তিনটে জায়গায় প্রদীপ ঘোষের বসানো শব্দ তিনি অনুমোদন করেছিলেন এবং তা ছাপাও হয়েছিল।

সদ্য প্রয়াত শিল্পীকে প্রণাম।

কবিতার জন্ম

বিষ

দীপঙ্কর মৌলিক

এক ছোবলে মুখে শৈশবের ফেনা তুলে
পিপাসায় গলায় ঢালি বিষ।
যদি সে বিষে প্রাণে মরি...
হাত পা দেহখণ্ড নকল হাসি নিয়ে
কালচে নীল রঙে ডুব দিই।
ছাই ভস্মে উড়ে যেতে পারি...
উড়তে উড়তে চিল শকুনের সাথে
আস্তাকুঁড় খুঁজে খুঁজে তুলে আনব
পচা গলা দেহ, খুবলে ছিঁড়ে...
শহুরে কুমিরের কান্নাঘেরা শরীর
অতি দ্রুত দুর্গন্ধ ছড়ায় বিষধর সাপ
সর্ সর্ গর্তে ঢুকে পড়ে...

চারিদিকে অবিশ্বাস, সামাজিক অস্থিরতা। বিপদে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষিত হচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই প্রায় একরকম হয়ে যাচ্ছি। জান্তব প্রবৃত্তিগুলোই শুধু টিকে থাকছে। কেউই আর কোনওভাবেই মানুষ নই। শুধু বিষ আর বিষ! বিষধর সাপও 'গর্তে ঢুকে পড়ে'।

রম্যরচনা

রম্য জুলিয়েট

গৌতমেন্দু রায়

বৃষ্টিটা থামার কোনও লক্ষণই নেই। কখনও মুষলধারে কখনও বা ঝিরঝির করে পড়েই চলেছে। তারই মধ্যে সনাতন বৈদ্য এসে তাঁর চেম্বার খুলেছেন। সনাতন বৈদ্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তাঁর চেম্বারের ঠিক ওপরে একটা মাঝারি সাইজের সাইনবোর্ড টাঙানো আছে। তাতে লেখা, পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ সনাতন বৈদ্য, ডিএমএস ।

প্রথমবার তাঁর চেম্বারে এলে অনেকেরই ভুরুদুটো একটু কুঁচকে যায়। কারণ, ডাক্তারবাবুর বয়সই মেরেকেটে ষাট-বাষট্টি হবে। মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি উনি দশ-বারো বছর বয়স থেকেই তাঁর প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন? সাইনবোর্ড তো সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। আসলে এর পেছনে যে রহস্যটা রয়েছে তা সবাই জানে না। আজ থেকে দশবছর আগে তিনি এক প্রয়াত হোমিও ডাক্তারের এই চেম্বারটি কিনে নিয়েছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সেই ডাক্তারবাবুর ছিল তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা। চেম্বার তো বটেই, দরদাম করে তিনি সেই চেম্বারের চেয়ার-টেবিল, তাকে সাজানো ওষুধপত্র, মান্ধাতার ঠাকুর্দার আমলের সিলিং ফ্যান, পুরোনো স্টেথো আর প্রেশার মাপার যন্ত্রটিও হস্তগত করে নিয়েছিলেন। তা সবই যখন বৈধভাবে তাঁর সম্পত্তি হয়ে গেল তাহলে ওই প্রয়াত ডাক্তারবাবুর অভিজ্ঞতাটাই বা তাঁর নিজের হবে না কেন? দোকানে গিয়ে একসঙ্গে অনেক জিনিসপত্র কিনলে একটা-দুটো তো অনেক দোকানদারই ফাউ দেয়, তাই না? তাই ফাউ হিসেবে ওই তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাটাই তিনি নিলেন। এর সঙ্গে নিজের কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা যোগ করে হল গিয়ে পঞ্চাশ। খুবই সরল হিসেব। কিন্তু অঙ্কটা বুঝতে না পেরে যদি কোনও পেশেন্টের ভ্রূযুগল বঙ্কিম হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে তাঁর তো কিছু করার নেই।

যাই হোক, একটানা বৃষ্টির সঙ্গে মেঘও ডেকে চলেছে গুড়গুড় করে। অথচ আজ একটি পেশেন্টেরও পেট গুড়গুড় করছে না। সনাতন ডাক্তার সিলিং ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে তালপাতার পাখার বাতাস খাচ্ছেন স্বহস্তে। কারেন্টের অযথা অপচয় করে কী লাভ? ইদানীং মোমবাতির অনেক দাম বেড়ে গিয়েছে, তা না হলে উনি হয়তো বেশি পাওয়ারের বাল্বটা অফ করে দিয়ে আজ মোমবাতিই ধরাতেন। ডাক্তার সনাতন বৈদ্যর চেম্বারে এই এক বৈশিষ্ট্য আপনি দেখবেন। তাঁর চেম্বারে যেমন বেশি পাওয়ারের লাইট জ্বলে তেমনই বেশি পাওয়ারের ওষুধও পাওয়া যায়। ওয়ান এম, টেন এম, ফিফটি এম--এরকম সাংঘাতিক সব পাওয়ার। সেই মারাত্মক ওষুধের সঙ্গে পাঙ্গা লড়ে রোগ আর বেশিদিন টিকতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই রুগি চাঙ্গা হয়ে দৌড়াতে শুরু করে।

বৃষ্টিটা আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না।

সনাতন ডাক্তার ভাবলেন, আজ আর বসে থেকে কাজ নেই। তার চাইতে বাড়ি গিয়ে গিন্নিকে অনুরোধ করা ভালো, যদি উনি গরম গরম খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ান। খিচুড়ির কথা ভাবতেই তাঁর মনটা আনচান করে উঠল। তিনি গেয়ে উঠলেন আপন মনে-- 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়।' সনাতন ডাক্তার চেম্বার বন্ধ করবেন বলে প্রায় উঠেই পড়েছিলেন। এমন সময় একটি তরুণী তাঁর চেম্বারে এসে ঢুকল। সে কেমন একটা চিন্তিত মুখে বলল-- 'ওহ্, আপনি রয়েছেন? ভেবেছিলাম আজ হয়তো আপনাকে ধরতেই পারব না।' আমাকে আপনি চিনতে পারলেন? আমি জুলিয়েট। সনাতন বৈদ্য তাঁকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তরুণীটি বলল-- 'অনেক আগে আপনার কাছে একবার এসেছিলাম। সেবার গলায় মাছের কাঁটা বিঁধেছিল। এবারে আমি এসেছি অন্য এক কাঁটা নিয়ে। গত পনেরো দিন ধরে আমি কেবল যাচ্ছি আর আসছি। আর ব্যাপারটা খুব ঘনঘন হচ্ছে।' সনাতন ডাক্তার বললেন-- 'পনেরো দিন ধরে পৈটিক গোলযোগ! বলছ কী? আগে এলে না কেন?' মেয়েটি বলল-- 'আরে না না, সেসব কিছু নয়। আমার প্রেমিকের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়েছে জানেন? সে গত দু'সপ্তাহ ধরে আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখছে না। ফোনও বন্ধ। তাই আমি ঘনঘন বারান্দায় যাচ্ছি আর আসছি। দেখছি সে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি না। কিন্তু আমিও এবার একটু কড়া হতে চাই। আমাকে একটা হাইপাওয়ারের ওষুধ দিন তো, যাতে আমার মনের এই ব্যাকুলতা দূর হয়ে যায়।' আজ এই নিষ্ফলা দিনে একমাত্র পেশেন্টকে ফেরানো ঠিক নয়। সনাতন ডাক্তার তাই প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন। ভারী কাচের চশমার ভেতর দিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন-- 'তোমার এই জুলিয়েট নামটা কে রেখেছিল? রোমিওকে না পেয়ে তোমার এই ব্যাকুলতার মর্ম আমি বুঝতে পারছি বটে।' মেয়েটি ডাক্তারকে অবাক করে দিয়ে বলল-- 'আমার এই নামটা আমি নিজেই রেখেছি। তার পেছনে একটা কারণও ছিল। ডাক্তারের কাছে নাকি কিছুই লুকোতে নেই। তাই আপনাকে সব খুলেই বলি।' সনাতন ডাক্তার চমকে উঠে বললেন-- 'আরে না না, সব খুলে বলতে হবে না। মুখে বললেই হবে। আমি বেশ বুঝতে পারব।' মেয়েটি এবার গুছিয়ে বসে তার নামকাহিনী শুরু করল। 'আসলে হয়েছিল কী, আমি হওয়ার আগে আমার মায়ের নাকি বারবার লেবার পেইন উঠছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই হচ্ছিলাম না। চারবার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পঞ্চমবারে আমি হলাম। মা যে চারবার ফলস খেয়েছে সেকথা অনেকেই জানত। তাই বড় হয়ে ওঠার পর আমাকে নিয়ে বড়রা ঠাট্টা করত। টিটকিরি দিয়ে বলত, কী রে, তুই তো তোর মাকে ঝুলিয়ে রেখেছিলি। সবাই আমাকে এই 'ঝুলিয়ে', এই 'ঝুলিয়ে' বলে খ্যাপাত। আমি ভয় পেয়ে ভাবলাম, আমার নামটা বোধহয় পারমানেন্টলি 'ঝুলিয়ে'ই হয়ে যাবে। সে কারণেই ওই ঝুলিয়ের সঙ্গে মিল রেখে আমি আমার নামটাকে জুলিয়েট করে নিয়েছি। হঠাৎ করে শুনলে ঝুলিয়ে আর জুলিয়েট তো প্রায় একই রকম লাগে তাই না?' ওই যে বলে না? প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ না কী যেন? এ কথার কী উত্তর দেওয়া যায়, ডাক্তারবাবুর তা মাথায় এল না। উনি শুধু বললেন-- 'ওষুধ লিখে দিলাম, নিয়ম করে খাবে। আশাকরি তোমাকে আর আসতে হবে না।'

> চেম্বার যখন কিনলেন ফাউ হিসেবে ওই তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাটাও নিলেন সনাতন ডাক্তার। এর সঙ্গে নিজের কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা যোগ করে হল পঞ্চাশ। খুবই সরল হিসেব।

দু-ছক্কা পাঞ্জা

নির্জন দ্বীপে প্রিয় ভুট্টোকে নিয়ে ছুট, করোনাকে সামনে পেলে তিন ছক্কা পুট

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

সাহিত্যিক

জন্মদিন: ১২ জুন।
ডাকনাম: মন।
মেয়েবেলার দুষ্টুমি: অগুনতি। পাড়ার সেরা দুষ্টু ছিলাম।
প্রথম লেখা: 'তুফানগঞ্জ বার্তা' নামে একটি পত্রিকায় গল্প।
অনুপ্রেরণা: লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন স্বর্গত শঙ্কর দত্তগুপ্ত, আমৃত্যু।
প্রথম প্রেম: মনে নেই, তবে এখনও রিলেশনশিপে আছি। তিনি এক লেখিকা (বিয়ের প্রশ্নই নেই)।
কী হতে চেয়েছিলেন: গায়িকা হবার স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নই রয়ে গেছে।
লেখাজোকা: সৃষ্টি তো সন্তানের মতো, সবই আমার কাছে সেরা। তবে ব্রতকথার ৫০টি গল্প খুব খেটে করেছিলাম।
যার লাগি অশ্রু ঝরে: আমার গানের দলটার জন্য।
জীবনের সেরা মুহূর্ত: প্রথম যেবার অধীর বিশ্বাস হাতে ধরে গদ্য লেখা শিখিয়েছিলেন।
আনন্দে-বিষাদে সেই তিনি: আমার কর্তা, দেবাশিস ভট্টাচার্য।
লেখালেখির বাইরে: চাকরি করি না, লেখালেখিও অল্প। বাগান করতে, আলপনা দিতে খুব ভালোবাসি।
যে প্রশ্ন আজও নিজেকে করি: অনেক পরিশ্রম করে কাজ করি কিন্তু স্বীকৃতি পাই না, ভাবলেই বোকা বনে যাই।
নির্জন দ্বীপে একমাত্র সঙ্গী: আমার প্রিয় ল্যাব্রেডর ভুট্টো।
নিজের লেখা দু-লাইন: 'লাটাই আছে বলেই ঘুড়ির আর পাখি হওয়া হল না' (আমার উপন্যাস 'মাটির পিঞ্জিরা'র প্রথম লাইন)।
করোনার মুখোমুখি হলে: কী আর, তিন ছক্কা পুট!
শেষ ইচ্ছে: মরে গেলে যেন উত্তরবঙ্গ সংবাদে একটা খবর হয় (আজ আমি যতটুকু তা এই পত্রিকারই দান)।